সাক্ষাতকার

মিলন কথা

জনপ্রিয় লেখক ইমদাদুল হক মিলনের সাথে কথোপকথন

দিলরুবা মালেক

অপরিচিত বাঙালি এক বাসার কলিং বেল টিপে অপেক্ষা করছি। ভেতর থেকে এক ভদ্রলোক আমাকে দেখে দরজা খুললেন। 'আপনিই *প্রিয়বাংলা* থেকে এসেছেন?' মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে অত্যন্ত পরিপাটি করে সাজানো একটা লিভিং রুমে এসে বসলাম। উদ্দেশ্য বাংলাদেশ থেকে আগত জনপ্রিয় লেখক ইমদাদুল হক মিলনের সাক্ষাতকার নেয়া। ভদ্রলোক বললেন মিলন ভাই ফ্রেশ হয়ে আসছেন, আপনি বসুন। অগত্যা অপেক্ষার পালা। উপর থেকে নেমে এলেন খান আতাউর রহমানের মেয়ে রুমানা। পরিচিত হলাম ফোবানার উদ্দেশ্যে আগত শিল্পী রুমানার সাথে। তার একটু পরই লেখক মিলন ঢুকলেন লিভিং রুমে। বললেন, 'তুমিই এসেছ ইন্টারভিউ নিতে? চল, ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসি'। শুরু হলো আমাদের কথামালা।

প্রিয়বাংলা: আপনার ছেলেবেলা সম্পর্কে বলুন। কেমন কেটেছে ছেলেবেলা?

ইমদাদুল হক মিলন: আমার জন্ম ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ সালে বিক্রমপুরে। আগে ঢাকা জেলা ছিল, এখন সেটা বদলে মুন্সীগঞ্জ জেলা হয়েছে। আমি প্রায় ১২ বছর পর্যন্ত আমার নানীর কাছে বড় হয়েছি। আমরা ১১ ভাইবোন। এতগুলো ছেলেমেয়েকে দেখাশুনা করা খুব কঠিন একটা ব্যাপার। তাই আমাকে আমার নানীর কাছে রাখা হয়েছিল। ওখানেই গ্রামে একটা স্কুলে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছি। ১৯৬৬ সালে আমি ঢাকায় চলে আসি। গেন্ডারিয়া হাই স্কুলে ক্লাস সিক্সে ভর্তি হই। এই তো আমার ছেলেবেলা। খুব একটা আনন্দে কাটেনি। অনেকটা বিষণ্নতার মধ্যেই বেড়ে উঠা। গ্রামের বিশাল বিশাল সব গাছপালাসহ বাড়িঘর, নির্জন দুপুর– সব মিলিয়ে বিষণ্ন একটা ব্যাপার। ছেলেবেলায় সবাই সাঁতার কাটে, গুলতি দিয়ে পাখি শিকার করে, খেলাধুলা করে। আমার এসব করা হয়ে ওঠেনি। আসলে আমি নিজেও একটু চুপচাপ ধরনেরই ছিলাম ছেলেবেলায়।

প্রিবাং: ঢাকায় এসে হাইস্কুলে ভর্তি হলেন। তারপর কোথায় পড়াশুনা করলেন? শৈশব ছাড়িয়ে কৈশোর কেমন কাটল?

ই.হ.মি: গেন্ডারিয়া স্কুল থেকে এসএসসি দিলাম। যদিও ১৯৭১ সালে পরীক্ষা দেয়ার কথা ছিল। যুদ্ধ শুরু হবার ফলে সেটা আর হলো না। পরের বছর ১৯৭২ সালে এসএসসি দিলাম। তারপর জগন্নাথ কলেজে পড়লাম। এসএসসি আর এইচএসসি দুটোতেই সায়েন্সে ছিলাম। কিন্তু অনার্স পড়তে গেলাম পুরোপুরি ভিন্ন এক সাবজেক্টে, ইকনোমিক্সে। কেন গেলাম সেটাও বলি। আগেই বলেছি আমরা অনেক ভাইবোন। ১৯৭১ সালে আমার বাবা মারা যান। তাই এই বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করলাম। আমার মনে আছে আমি ক্লাস নাইন/টেন থেকেই অনেক টিউশানি করতাম যদি আমার রোজগারে সংসারে একটু সচ্ছলতা আসে এই ভেবে। আমার খুব শখ ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার। সেই ইচ্ছে পূরণ হয়নি ভাল ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও। সুতরাং ওই বয়সের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মতো আমার জীবনটা তেমন আনন্দে কাটেনি।

প্রিবাং: সায়েন্স থেকে চলে গেলেন ইকনোমিক্সে, আবার ইকনোমিক্স থেকে পুরোপুরি ভিন্ন একটা জগতে। সেটা কিভাবে সম্ভব হলো?

ই.হ.মি: লেখক হবার ব্যাপারটা আসলে খুব ইন্টারেস্টিং। আমাদের পরিবারে এই পেশায় কেউ নেই। আমার ব্যাপারটা কিভাবে হলো? আমি যখন ইন্টারমিডিয়েট পড়ি তখন আমার এক বন্ধু দৈনিক পত্রিকার ছোটদের পাতায় লিখত এবং আমাদেরকে তার লেখার কাটিং দেখাত আর ভীষণ গর্ব করত। যেন বিশ্ব জয় করে ফেলেছে। এই ব্যাপারটা আমাকে একটু নাড়া দিল। আমি ভাবলাম, আরে ও পারলে আমি পারব না কেন? সুতরাং আমিও একটি ছোটদের লেখা লিখলাম। নাম দিলাম 'বন্ধু'। ছোট একটি বাচ্চার সাথে একটি বানরের বন্ধুত্বের গল্প। ঠিক এক সপ্তাহ পর লেখাটি ছাপা হলো। আমি যখন আমার নিজের নাম ছাপার অক্ষরে দেখলাম তখন মনে হলো এটা তো বিশ্ব জয় করার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এই তো শুরু। তারপর একের পর এক লিখলাম বিভিন্ন পত্রিকায়। সব লেখাই ছাপা হতো। তাই আমার মধ্যে একটা নেশা ঢুকে গেল। এদিকে পড়াশুনায় মনোযোগ দিতে পারতাম না বলে অনার্সে রেজাল্ট ভাল হলো না। পরে আর মাস্টার্সও করা হয়নি। এইভাবেই চলে এলাম লেখালেখিতে। আরও একটা ব্যাপার। আমার নাম ছিল ইমদাদুল হক খান। ডাক নাম মিলন। ১৯৭১ সালে 'খানসেনা' নামক একটা ঘৃণিত বাহিনী ছিল। তাই আমি আমার নাম থেকে খান শব্দটা বাদ

দিয়ে মিলন জুড়ে দিলাম। সেই থেকে আমার নাম হয়ে গেল ইমদাদুল হক মিলন। পরে দেখা গেল এই নামটাই ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হতে লাগল। লেখালেখির মাধ্যমে আমি ধীরে ধীরে বিশিষ্ট কেউ হয়ে যাচ্ছি এই বোধটা আমার মধ্যে ভীষণ কাজ করত। আর তাই লেখালেখিটা অনেকটা নেশার মতোই হয়ে গেল।

প্রিবাং: এই যে তরুণ বয়সে লেখালেখি করতেন, কখনো পয়সা পেয়েছেন? কেমন লেগেছে প্রথম পারিশ্রমিক?

ই.হ.মি: এই ব্যাপারটা একটু পরে এলো। আমি লেখালেখি করতাম ১৯৭৩ সাল থেকে। প্রথম পয়সা পেলাম ১৯৭৫ সালের দিকে। আমার মনে আছে একটা লেখার জন্য প্রথম পেয়েছিলাম ১০ টাকা। তখন ১০ টাকা অনেক না হলেও পুরোপুরি ভিন্নধর্মী একটা কাজ করে টাকাটা পেলাম বলে ভীষণ ভাল লেগেছিল।

প্রিবাং: লেখাকে পেশা হিসেবে নিলেন কবে থেকে?

ই.হ.মি: এটা বলতে গেলে একটু পেছনে যেতে হয়। আমি ১৯৭৯ সালে জীবিকার জন্য পশ্চিম জার্মানী চলে যাই। যেহেতু পড়াশুনা ভাল হয়নি, বড়ভাই যে ব্যবসা শুরু করেছেন সেখানে কিছুদিন চেষ্টা করেও কিছু হলো না– তাই আমি অন্য কিছু করার চিন্তা করছিলাম। সে সময় অনেকেই পশ্চিম জার্মানীতে যাচ্ছিল জীবিকার জন্য। শুনেছিলাম গিয়ে সবাই খুব ভাল করে। তো আমিও ভাবলাম ওখানে গেলে যদি আমাদের সংসারের একটু উন্নতি হয়। কিন্তু গিয়ে দেখলাম অত্যন্ত কষ্টের একটা জীবন। অড জব করতে হয়। প্রচন্ড ভারি আলুর বস্তা টানতে হয়। আমার ভীষণ কষ্ট হতো। আমি কিছুদিন করতাম, তারপর কিছুদিন বিশ্রাম নিতাম। ওই সময় আমার মনে হতো, যত ছোটই হই আমি তো একজন লেখক। আমি কেন আলুর বস্তা টানব। এই বোধ থেকে দেশে চলে এলাম পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে। তখন আমার সাথে একটি মেয়ের ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। ফিরে আসাতে সেই মেয়েটিও খুব একটা খুশি হলো না। আমরা বিয়ে করলাম ১৯৮২ সালে। তখন সাপ্তাহিক *রোববার* নামে একটি পত্রিকায় কাজ করতাম। এক সময় সেটাও চলে গেলে আমাকে বাসা থেকে বের করে দেয়া হলো। ১৯৮৪ সালে আমি পকেটে ১৫ টাকা নিয়ে আমার স্ত্রীসহ বের হয়ে আসি। আমার শ্বশুর বললেন, আমি ফ্ল্যাট কিনে দিচ্ছি। তোমরা এখানে থাক। কিন্তু আমার ওই বয়সের ইগোটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠল। আমার স্ত্রীকে ওদের বাসায় রেখে আমি পাশেই একটা ছোট ঘর ভাড়া নিলাম। আমার মনে আছে সেখানে একটা চৌকি আর একটা চেয়ার-টেবিল ছাড়া কিছুই ছিল না। ওই ঘরে বসে আমি অনেক পড়াশুনা করতাম। আমার স্ত্রী তখন অন্তঃসত্ত্বা। যখন আমার প্রথম মেয়ের জন্ম হলো– ওর সুন্দর মুখটা দেখেই ভাবলাম আমার কিছু করা উচিত। তখনই লেখাটাকে পেশা হিসেবে নেয়ার চিন্তা করলাম। সেটা ১৯৮৪ সাল। তারপর প্রচুর লেখালেখি করলাম। একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট কিনে ওখানে উঠলাম। আস্তে আস্তে জনপ্রিয় হতে থাকলাম।

প্রিবাং: আপনার লেখার প্রিয় বিষয় কি? আপনার নিজের লেখা কোন বইটি আপনার বেশি ভাল লাগে।

ই.হ.মি: আমি আসলে দুই ধরনের লেখা লিখি। আমার প্রথম উপন্যাস *যাবজ্জীবন*। প্রথম গল্পের বই *ভালবাসার গল্প*। নাম দুটো দেখলেই তুমি কিন্তু বুঝতে পারবে দুটো পুরোপুরি ভিন্ন ধরনের লেখা। সেই সময়ের আরো কিছু লেখা আছে, সিরিয়াস ধরনের। যেমন *পরাধীনতা*, *নিরন্নের কাল*। কিন্তু আমি যেহেতু লেখালেখি করে জীবন ধারণ করব বলে ভেবেছি, তাই আমাকে এমন কিছু লিখতে হবে যেটা সাধারণ মানুষ বেশি পছন্দ করে। যেমন প্রেমের উপন্যাস। সুতরাং ব্যবসায়িক লেখা শুরু করলাম। যেমন *রাধা-কৃষ্ণের গল্প*, *কোন কাননের ফুল*, *নায়ক*। সিরিয়াস লেখার পাঠক কিন্তু পুরোপুরি ভিন্ন। সিরিয়াস লেখার জন্য আমি প্রশংসিত হতাম। কিন্তু তেমন পয়সা আসত না। সুতরাং দুই ধরনের লেখাই লিখতাম। আমার নিজের লেখা উপন্যাসগুলোর মধ্যে ভাল লাগে '*নূরজাহান*'। মৌলবাদীদের নিয়ে একটি সিরিয়াস ধরনের লেখা। এই লেখাটি নিয়ে আমি খুব গর্বিত।

প্রিবাং: পশ্চিম বাংলার সাহিত্য আর আমাদের দেশের বাংলা সাহিত্যের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। সেটাকে কিভাবে দেখেন?

ই.হ.মি: পার্থক্য অবশ্যই আছে। সেই সাথে কিছু মিলও আছে। মিলের কথাটাই আগে বলি। মিলটা হচ্ছে অনেকটা ব্রিটেন আর আমেরিকার মতো। দুই জায়গার ভাষা একই- ইংরেজি। কিন্তু কালচারের জন্য দুই দেশের সাহিত্য দুই ধরনের। স্বাধীনতার আগে পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যই বাংলা সাহিত্য ছিল। বাংলাদেশে কবি ছিলেন, কিন্তু উপন্যাস লেখার মতো কেউ ছিল না। হুমায়ূন আহমেদ, আমি এবং আরো কিছু লেখক স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের ভাষায় আমাদের মতো করে উপন্যাস লিখে মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিকদের প্রতিহত করে আমাদের লেখাগুলো জনপ্রিয় করে তুললাম। নিজস্ব পাঠক গোষ্ঠি তৈরি করলাম। সুতরাং পার্থক্য তো থাকবেই।

প্রিবাং: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদারের মতো মৌলিক লেখা কেন আমাদের দেশের জনপ্রিয় লেখকরা লিখছেন না? আপনার কি মনে হয়?

ই.হ.মি: লিখছেন না তা ঠিক নয়। লিখছেন, তবে কম। বাংলাদেশের লেখকদের ভাল কিছু লেখার কথা তোমাকে বলি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *লাল সালু*, *চাঁদের অমাবস্যা*, *কাঁদো নদী কাঁদো*; আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই*, *খোয়াবনামা*; শওকত ওসমানের *জননী*, *ক্রীতদাসের হাসি*; সেলিনা হোসেনের *গায়ত্রী সন্ধ্যা*। সুতরাং ভাল অনেক লেখাই আছে অনেক ভাল লেখকের। কিন্তু সেগুলোর খবর সেভাবে সবাই রাখে

না। সুনীল বা সমরেশ জনপ্রিয় লেখক বলেই হয়তো তাদের লেখার খবর রাখে। তাছাড়া আমাদের লেখার ইতিহাস ৩৫ বছরের আর ভারতের লেখার ইতিহাস ২০০ বছরের। তাদের সাথে আমাদের তুলনা করলে তো হবে না। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। ভবিষ্যতে হয়তো আরো ভাল লেখা হবে।

প্রিবাং: হুমায়ুন আহমেদের লেখা পড়েন? তার জনপ্রিয়তার কারণ কি বলে আপনার মনে হয়?
ই.হ.মি: হ্যাঁ। আমি হুমায়ূন আহমেদের লেখা পড়ি। ভাল লাগে। তার জনপ্রিয়তার কারণ হলো তার লেখার মধ্যে মজা করার পরিমাণটা অনেক বেশি। তাছাড়া জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির বিষয়গুলো তুলে ধরেন বলেই হয়তো তার লেখা বেশি জনপ্রিয়।

প্রিবাং: এবার একটু ভিন্ন কথা বলি। আপনার পড়াশুনা এক দিকে, জীবিকা পুরোপুরি ভিন্ন একটা দিকে। আর এখন আপনাকে দেখা যাচ্ছে অন্য আরেক দিকে– এনটিভিতে উপস্থাপকের ভূমিকায়। এ সম্পর্কে একটু বলুন।
ই.হ.মি: আসলে আধুনিক জীবনে শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতে থাকলে চলবে না। তাই টিভি মিডিয়াতে আসা। আমি সব সময় অনুভব করি মিডিয়ার একটা প্রভাব সব জায়গায় আছে। যেমন টিভি নাটক যখন জনপ্রিয় হয় তখন আমাদের বইয়ের বিক্রিও অনেক বেড়ে যায়। সুতরাং আমার মনে হলো মিডিয়াতে কিছু কাজ করা উচিত। প্রায় ৫/৬ বছর আগে চ্যানেল আইতে 'মিলন কথা' নামে আমি একটা টক শো করতাম। অনুষ্ঠানটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। 'মিলন কথা' নামটা দিয়েছিলাম নতুন মানুষের সাথে মিলন বা পরিচয় হওয়া অর্থে, আমার নাম মিলন বলে নয়। এই অনুষ্ঠানটা মাঝে মাঝে করতাম, সবসময় না। সেটা দেখে চ্যানেল আই থেকে আমাকে বলা হলো একটি টক শো করার জন্য। আমি একটি টক শো'র কথা চিন্তা করলাম সেলিব্রেটিদের নিয়ে 'কি কথা তাহার সাথে'। এই অনুষ্ঠানের কয়েক পর্ব রেকর্ড করার পর আমাকে বলা হলো অনুষ্ঠানটি প্রতিদিন করার জন্য। সেটা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। তাদেরকে বললাম প্রতিদিন নয়, সাপ্তাহিকভাবে করা যেতে পারে। কিন্তু চ্যানেল আই-এর পক্ষে সেটা সম্ভব না হওয়ায় আমি এনটিভিকে প্রপোজাল দিলে ওরা সেটা মেনে নিল। এখন এনটিভিতেই অনুষ্ঠানটা করছি।

আমরা নয় মাসের একটা যুদ্ধ করেছি। স্বপ্ন নিয়ে দেশটা স্বাধীন করেছি। হয়তো স্বাধীন দেশ নিয়ে আমাদের যে স্বপ্ন ছিল সেটা পূরণ হয়নি। ভবিষ্যতে হয়তো পূরণ হবে। স্বপ্ন পূরণ হয়নি বলে কিন্তু স্বপ্ন শেষ হয়ে যায়নি। এই স্বপ্ন পূরণ করতে হলে আমাদের প্রয়োজন দেশপ্রেম। আমাদের অসৎ উপায়ে টাকা রোজগারের প্রবণতা আছে, রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভ আছে, রাজনীতি করে টাকা চুরির প্রবণতা আছে। যেটা নেই সেটা হলো দেশপ্রেম। এই দেশপ্রেম প্রকৃত অর্থে যখন আসবে তখন দেশ নিয়ে আমাদের স্বপ্নও সফল হবে। আমি এরকম একটা দেশের স্বপ্নই দেখি।

প্রিবাং: স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর একটা প্রভাব পড়ছে আমাদের সমাজে। সেটাকে কিভাবে দেখেন?
ই.হ.মি: ভাল প্রভাবও পড়ছে, খারাপ প্রভাবও পড়ছে। ভাল বলার কারণ ঘরে বসে রিমোট টিপলেই সারা বিশ্বের খবর পাওয়া যাচ্ছে। আর খারাপ প্রভাবের কথা বলতে পারি এভাবে– ভারতের কিছু ড্রামা সিরিয়াল আমাদের দেশে বেশ জনপ্রিয়। সিরিয়ালগুলো জনপ্রিয় কারণ তাতে পরকিয়া সম্পর্ক বেশি দেখানো হচ্ছে। আর নিষিদ্ধ জিনিসের আকর্ষণ তো থাকেই। যার খারাপ প্রভাব পড়ছে আমাদের সামাজিক জীবনে।

প্রিবাং: বাংলাদেশ নিয়ে একজন লেখক হিসেবে আপনার পরিকল্পনা কি?
ই.হ.মি: তুমি তো আমার প্রশ্নটাই করলে। আমার এনটিভির অনুষ্ঠানে এই প্রশ্নটা সব অতিথিদের করা হয়। আমি আসলে পজেটিভ মানুষ, একজন আশাবাদী মানুষ। আমি স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি আর মানুষকেও দেখাতে ভলবাসি। আমি অনেক বড় কিছুর স্বপ্ন দেখি। আমরা নয় মাসের একটা যুদ্ধ করেছি। স্বপ্ন নিয়ে দেশটা স্বাধীন করেছি। হয়তো স্বাধীন দেশ নিয়ে আমাদের যে স্বপ্ন ছিল সেটা পূরণ হয়নি। ভবিষ্যতে হয়তো পূরণ হবে। স্বপ্ন পূরণ হয়নি বলে কিন্তু স্বপ্ন শেষ হয়ে যায়নি। এই স্বপ্ন পূরণ করতে হলে আমাদের প্রয়োজন দেশপ্রেম। আমাদের অসৎ উপায়ে টাকা রোজগারের প্রবণতা আছে, রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভ আছে, রাজনীতি করে টাকা চুরির প্রবণতা আছে। যেটা নেই সেটা হলো দেশপ্রেম। এই দেশপ্রেম প্রকৃত অর্থে যখন আসবে তখন দেশ নিয়ে আমাদের স্বপ্নও সফল হবে। আমি এরকম একটা দেশের স্বপ্নই দেখি।

এই বলে লেখক উঠে দাঁড়ালেন। প্রায় দুই ঘণ্টা কথা হয়েছে। এই প্রথম বললেন, শেষ হয়েছে তো না? তখনই যে ভদ্রলোক দরজা খুলে দিয়েছিলেন তিনি এসে বললেন ডিনার করে যান। দ্রুত ডিনার পরিবেশনে ব্যস্ত হয়ে গেলেন তিনি।

***বিদ্রঃ** লেখকের মতো আমিও লেখার নাম 'মিলন কথা' দিয়েছি। তার কারণ নতুন একজন মানুষের সাথে আমার পরিচয় হলো। মিলন পরিচয় অর্থেই ব্যবহার করা হলো।*

এক নজরে ইমদাদুল হক মিলন

জন্ম: ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫।
ছেলেবেলা: বিক্রমপুরে নানীর কাছে কেটেছে।
প্রবাস জীবন: ১৯৭৯ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত পশ্চিম জার্মানী।
প্রথম চাকরি: সাপ্তাহিক *রোববার* ১৯৮৪।
প্রিয় ঘটনা: বড় মেয়ের জন্ম।
প্রথম লেখা: 'বন্ধু', ছোটদের গল্প।
প্রথম উপন্যাস: যাবজ্জীবন।
প্রিয় উপন্যাস: নূরজাহান
প্রিয় লেখক: রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, তারা শংকর, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।
পুরস্কার প্রাপ্তি: বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৯২), বিশ্ব জ্যোতিষ সমিতি পুরস্কার (১৯৮৬), ইকো সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৭), হুমায়ুন কাদির সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯২), বিজয় পদক (১৯৯৪), টেনাশিনাস পদক (১৯৯৫), মাদার তেরেসা পদক (১৯৯৮), এস এম সুলতান পদক (১৯৯৯), অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক (২০০০), চোখ সাহিত্য পুরস্কার কলকাতা (২০০১) সহ আরো অনেক।